***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's***
*Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 291 – 304*
*Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com*
*e ISSN : 2583 – 0848*

# গণনাট্যের নাট্যভাষা ও বাংলা নাটক

ফণিভূষণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জোসেফ'স কলেজ, নর্থ পয়েন্ট, দার্জিলিং
ইমেইল : mondalphanibhuson@gmail.com

## Keyword
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ, পিপলস থিয়েটার, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বামপন্থা, নাট্যদর্শন ও প্রকরণ, বিজন ভট্টাচার্য, নাট্যভাষা ও বাংলা নাটক।

## Abstract
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে একদিনে গঠে ওঠেনি। ১৯৪৩ সালের ২৫ মে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। যদিও তার বছর দুয়েক আগেই ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে ব্যাঙ্গালোরেই শ্রীমতী অনিল ডিসিলভা'র উদ্যোগে 'পিপলস থিয়েটার' নামক একটা গণসাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। মাস তিনেক বাদেই তিনি ব্যাঙ্গালোর থেকে বোম্বাই চলে আসতে বাধ্য হন এবং তাঁর হাত ধরে ১৯৪২ সালের মে মাসে 'পিপলস থিয়েটার' আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়েছিল। মনে রাখা জরুরী এর ঠিক এক বছর পর আই পি টি এ-র সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। যদিও বোম্বাইয়ে ১৯৪৩ সালের ২৫ মে আই পি টি এ-র প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের আগে ব্যাঙ্গালোর ও বোম্বাই ছাড়াও মালাবার, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো জায়গাতেও পিপলস থিয়েটারের আদর্শে ছোট আকারে হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত, এই 'পিপলস থিয়েটার' গড়ে তোলার নেপথ্যে রমাঁ রঁলার *দ্য পিপলস থিয়েটার* নামক বিখ্যাত বইটির একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। প্রগতি আন্দোলনের সুবাদে রলাঁর *The People's Theater* গ্রন্থটি লেখক সাহিত্যিক শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ১৯৪৩ সাল থেকে ভারত তথা বাংলায় যে গণ-সংস্কৃতির চর্চায় লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য প্রথমসারির অন্যতম নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। গণনাট্যের শুরুর পর্বে বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন, জবানবন্দী* ও *নবান্ন* নাটক তিনটির পাশাপাশি বিনয় ঘোষের *ল্যাবরেটরী,* মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের *হোমিওপ্যাথি,* সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের *কেরানী* ও *অঞ্জনগড়* ইত্যাদি নাটক রচিত হয়েছিল। আমরা এখানে বিজন ভট্টাচার্যের তিনটি নাটকের পাশাপাশি অন্যান্য নাটকগুলিরও একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করবো কীভাবে গণনাট্যের নাট্যভাষা বাংলা নাটকের স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেছিল?

*Trisangam International Refereed Journal (tirj)*
*A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's*
*Volume-3, Issue-II, April 2023, tirj/April23/article -38*
*Website: www.tirj.org.in, Page No. 291-304*

## Discussion

'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর স্মরণীয় ঘটনা' —এমনই মত পোষণ করেছিলেন নাটককার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।[১] ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা কবে এবং কীভাবে হয়েছিল— আমরা তা সবিস্তারে আলোচনা করে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো যে, বাংলা তথা ভারতীয় প্রেক্ষিতে গণনাট্যের নিজস্ব কোনো নাট্যভাষা গড়ে উঠেছিল কিনা? আর যদি গণনাট্যের নিজস্ব কোনো নাট্যভাষা গড়ে উঠে থাকে তাহলে তা বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কতখানি স্বতন্ত্র পথ তৈরি করেছিল? ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ২৩ মে থেকে পয়লা জুন বোম্বাইয়ে (অধুনা মুম্বাই) ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আয়োজনে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সর্বভারতীয় সম্মেলন এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[২] চিন্মোহন সেহানবীশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ান থেকে জানা যায় যে, সর্বভারতীয় এই সম্মেলন উপলক্ষে বাংলা থেকে লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক (কমিউনিস্ট পার্টির) নেতা ও কর্মী মিলিয়ে প্রায় তেইশজনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩] এখানে উল্লেখ করা দরকার, বোম্বাই যাওয়ার পূর্বে (চিন্মোহন সেহানবীশের বয়ান থেকে জানা যায় ১৯ মে ১৯৪৩ সালে হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বাই রওনা হয়েছিল বাংলার প্রতিনিধি দল, অর্থাৎ তার পূর্বেই) ১৯৪৩ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে তখনকার নাট্যভারতীতে (পরবর্তীতে যা গ্রেস সিনেমা) অভিনীত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* এবং বিনয় ঘোষের *ল্যাবরেটরি* নাটিকা দুটি।[৪] বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* নাটিকাটি *অরণি* পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩ (বর্ষ ২/সংখ্যা ৩৩) সালেই প্রকাশিত হয়।[৫] অল্প কয়েকদিনের মহড়ায় *আগুন* নাটিকাটি মে মাসে অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু মে মাসের কত তারিখে হয়েছিল তার সুস্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

১৯৪৩ সালের ২২ মে বিকেল থেকেই বোম্বাইয়ে প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের সূত্রপাত হয়েছিল —যা চিন্মোহন সেহানবীশের 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে' শীর্ষক লেখা থেকে জানা যায়। এই সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর তালিকায় বাংলা থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম ছিল, কিন্তু সেদিন তাঁরা উপস্থিত না থাকায় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল। এছাড়া উর্দু সাহিত্যের পক্ষ থেকে ছিলেন বিখ্যাত কবি জোশ মালিহাবাদী, মারাঠি সাহিত্যের পক্ষ থেকে ছিলেন শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে, গুজরাটি সাহিত্যিক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিতুভাই মেহতা, তেলেগু সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে ধর্ম রাও এবং কানাড়ি ভাষার তরফ থেকে অধ্যাপক জাহাঙ্গীর দার প্রমুখগণ ছিলেন।[৬] সেদিন এঁরা সকলেই ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের ভাষণ সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল। তার কারণ হিসেবে চিন্মোহন সেহানবীশ জানিয়েছিলেন –

> "তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে তিনি যেভাবে মারাঠী সাহিত্যের প্রাচীন ও বর্তমান ধারার যাচাই করছিলেন তা সত্যই অদ্ভুত। লিখিত ভাষণ পাঠের মাঝে মাঝে তাঁর সরস টিপ্পনীগুলিও ছিল উপভোগ্য। বুদ্ধিজীবী সুলভ অস্পষ্ট মতামতের বালাই ছিল না তাঁর লেখার মধ্যে। শ্রমিক নেতার উপযুক্ত সুস্পষ্ট মত অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন বারবার।"[৭]

প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের ২৩ মে ১৯৪৩ সালের প্রথম অধিবেশনের সূচনা হয়েছিল উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। দেবব্রত বিশ্বাসের সুদক্ষ নেতৃত্বে বাঙালি গায়কদের সমবেত সংগীত পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানটি সভার সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। গানটি গাইবার পূর্বেই অবাঙালি সুধীবৃন্দদের উদ্দেশ্যে গানটির ইংরেজি তর্জমা শোনান হয়েছিল, যাতে সকলেই গানটির রসগ্রহণ করতে পারেন।[৮] পরের দিন অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ২৪ মে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে দামোদর থ্যাকারসে হলে 'জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব' শিরোনামে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে সেদিন অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), মহারাষ্ট্র, গুজরাট, বোম্বাই, বাংলা ও আসাম থেকে বিভিন্ন দল নিজেদের প্রদেশের নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করেছিলেন। সেদিনের এই অনুষ্ঠানটি ছিল প্রতিযোগিতামূলক, আর এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন— বাংলা থেকে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে শ্রীযুক্তা হাজরা বেগম এবং শ্রীযুক্ত চারি। এই প্রতিযোগিতায় সেদিন অন্ধ্রপ্রদেশের বলিষ্ঠ কৃষক গায়ক ও কমরেড নাজিরের নেতৃত্বে পরিবেশিত হয়েছিল 'বুরা কথা', 'টুনটুন' ও 'ওঝা'

প্রভৃতি লোকশিল্প; উত্তরপ্রদেশের সদস্যরা প্রযোজনা করেছিলেন 'রসিয়া', 'কাজরী' ও 'হোলী' ; মহারাষ্ট্র থেকে পরিবেশিত হয়েছিল 'পোয়াড়া' ও 'তামাশা'; গুজরাটের প্রতিনিধিরা পরিবেশন করেছিলেন 'গরবা' নৃত্য ; আসাম স্কোয়াড অঞ্জলি দাসের নেতৃত্বে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেছিলেন এবং বাংলা থেকে একদিকে নিবারণ পণ্ডিতের 'পাঁচালী পাঠ' অন্যদিকে বিনয় রায়ের পরিচালনায় গেরিলা গান 'হৈ হৈ হৈ জাপান' এবং কাইয়ুর শহীদদের নিয়ে লেখা 'ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কাইয়ুর বন্ধুদেরে' গান দুটি উপস্থাপিত হয়েছিল।[৯] বিনয় রায়ের লেখা ও পরিচালিত 'হৈ হৈ হৈ জাপান' গানটি উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় লেখা চাষি গেরিলার গান হিসাবেই খ্যাত। সেদিনের অনুষ্ঠানে গানটি যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল তার প্রমাণ মেলে চিন্মোহন সেহানবীশের ভাষ্যে –

> "অত্যন্ত সহজ ভাষা ও সুরের গানটি সুদূর পাঞ্জাব বোম্বাই ও অন্ধ্রপ্রদেশের হৃদয় জয় করেছিল। তাঁরা করতালি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, অনুরোধের পর অনুরোধ করে বাধ্য করেছিলেন বাংলার দলকে আবার এটিকে গাইতে। এই গানটির সুর গ্রাম্য হলেও অত্যন্ত জোরালো।"[১০]

অন্যদিকে সেদিন সকলের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল কাইয়ুর শহীদদের নিয়ে বিনয় রায়ের লেখা 'ফিরাইয়া দে দে দে মোদের কাইয়ুর বন্ধুদেরে'[১১] গানটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ঐ সময়েই কায়ুর শহীদদের নিয়ে হুগলি জেলার দয়াল কুমার 'কায়ুর মঙ্গল পাঁচালী' লিখেছিলেন। এই পাঁচালী জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিবেশিত হয়েছিল।[১২] এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পর রাত দশটায় হিন্দি ও উর্দুতে মুশায়রা পরিবেশন করেছিলেন — জোশ মালিহাবাদী, সাগর নিজামী, মাজাজ মখদুম, নরেন্দ্র শর্মা প্রমুখ বিখ্যাত কবিরা।[১৩]

সেদিনের ওই 'জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব' শীর্ষক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে বিচারকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে অন্ধ্রপ্রদেশকে প্রথম, বাংলাকে দ্বিতীয় এবং কেরলকে তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল।[১৪] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা জরুরী কেন সেদিন বাংলাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম হয়েছিল? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিরিখে চিন্মোহন সেহানবীশ সবিস্তারে তার কারণ উল্লেখ করেছিলেন –

> "অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথমস্থানের গৌরব লাভের কারণ ছিল সুস্পষ্ট। দেশের মাটির সঙ্গে যে সব রসরূপের যোগ হচ্ছে নিবিড় সেইগুলি নিয়েই সেখানকার (অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশের) কমুনিস্টরা কাজ আরম্ভ করেছেন। ... সংস্কৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলতে হলে তাকে গণজীবনের সঙ্গে প্রোথিত করতেই হবে, আর তার জন্যে প্রথমেই লোকশিল্পের রূপগুলিকে নিয়েই কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা দেশ থেকে অবশ্য আমাদের গানই ছিল সম্বল — একমাত্র ময়মনসিং-এর নিবারণ পণ্ডিতের পাঁচালী পাঠ ছাড়া। সে গান (বিনয় রায়ের দুটি গান) শ্রোতাদের হৃদয় জয় করেছিল, অক্লেশে হাততালিও বাঙলার দলই পেয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের থেকে একটা পার্থক্য সকলেরই চোখে পড়েছিল। আমরাও সংস্কৃতিকে নিশ্চয়ই ব্যাপকতম রূপ দিতে চাই ; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ গানের সুর ও কথা থেকে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল যে আমরা যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়েই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা করছি আর অন্ধ্রপ্রদেশ সেখানে শুরু করেছে লোকশিল্প নিয়ে একেবারে সোজাসুজি জনগণের মধ্যে। দুই প্রাদেশিক দলের প্রতিনিধিদের শ্রেণীরূপ থেকেই একথা আরও স্পষ্ট হয়। আমাদের বাঙলার দলে — দশরথলাল ও নিবারণ পণ্ডিত ছাড়া সবাই আসছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আর অন্ধ্রপ্রদেশের দলের সবাই ছিল কৃষক ও কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।"[১৫]

উপরি-উক্ত এই বক্তব্য থেকে দুটি প্রধান দিক উঠে আসে — **প্রথমত**, 'দেশের মাটির সঙ্গে' ওতোপ্রোতভাবে জড়িত যেসমস্ত লোকশিল্পকলাগুলি রয়েছে সেগুলিকে জনসাধারণের বোধগম্য অনুযায়ী তাদের সামনে পরিবেশন করা এবং তাদেরকে সংযুক্ত করার প্রাথমিক কর্মপ্রক্রিয়াটি অন্ধ্রপ্রদেশের কমিউনিস্ট পার্টি শুরু করেছিল। যদিও তাদের লোকশিল্প সম্পৃক্ত শিল্পকলা কলাকৌশলের দিক থেকে অনেকখানি শিথিল ছিল, তবুও তাদের লোক-সংস্কৃতির প্রায়োগিক শিল্পকলা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। **দ্বিতীয়ত**, বাংলার থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মূল তফাৎটি ছিল বাংলা 'যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়েই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা' করেছিল, অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ তাদের 'লোকশিল্প নিয়ে একেবারে সোজাসুজি জনগণের মধ্যে' প্রবেশ করেছিল। সেই সঙ্গে বাংলাদলের অধিকাংশ সদস্যই (ব্যতিক্রম দশরথলাল ও নিবারণ পণ্ডিত) ছিলেন মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ

দলের সকল প্রতিনিধিই ছিলেন 'কৃষক ও কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত'। এর পাশাপাশি চিন্মোহন সেহানবীশের চিন্তনে আর একটি বিশেষ ভাবনা কাজ করেছিল-

> "অবশ্য বাংলার সংস্কৃতি জগতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান নিশ্চয় উপেক্ষনীয় নয়, কিন্তু তার বর্তমান নিস্তরঙ্গ জীবনে জোয়ার আনতে হলে সে সংস্কৃতির সঙ্গে মজুর-চাষীর জীবনের যোগাযোগ ঘটাতেই হবে অতি দ্রুতগতিতে।"[১৬]

সেদিনের এই প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা যে শুধু চিন্মোহন সেহানবীশের হয়েছিল তা নয়, বরং বাংলা থেকে যে-সকল প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বিজন ভট্টাচার্যও সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার মাটির সঙ্গে যুক্ত কৃষক থেকে জনসাধারণকে নাটকে সরাসরি হাজির করতে হবে। কেননা, ততদিনে তিনি শুধুমাত্র *আগুন* নাটিকাটি লিখেছিলেন, যেখানে কলকাতা শহরের বুকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ চালের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই কি অল্পকিছুদিনের ব্যবধানে এই ভাবনাসঞ্জাত উপলব্ধির ফলে তাঁর হাত থেকেই গ্রামের চাষি পরাণ মণ্ডলকে নিয়ে *জবানবন্দী* এবং আমিনপুর গ্রামের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রধান সমাদ্দারকে ঘিরে *নবান্ন* নাটক জন্ম নিয়েছিল?

১৯৪৩ সালের ২৫ মে সকালেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সম্মেলনী অধিবেশন শুরু হয়েছিল। এই সম্মেলনে বাংলার বরিষ্ঠ অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। যদিও আগে থেকেই স্থির ছিল এই সম্মেলনে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাংলা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ করবেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য উপস্থিত না থাকায় তিনি পূর্বেই অনুষ্ঠিত (২২ মে) প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাংলা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।[১৭] এই সম্মেলন থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ (Indian People's Theatre Association) গঠিত হয় এবং প্রথম সম্মেলনে আই পি টি এ-র সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা এন এম যোশী (নারায়ণ মালহার যোশী)। তিনি আই পি টি এ-র সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সময় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং আইনসভার সদস্য ছিলেন। সভাপতির পাশাপাশি আই পি টি এ-র কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন কে এ আব্বাস এবং আই পি টি এ-র সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য হয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি এস এ ডাঙ্গে, প্রগতি লেখক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জাহির, সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি বঙ্কিম মুখার্জি ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অরুণ বসু প্রমুখ। আই পি টি এ-র প্রথম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী অনিল ডিসিলভা।[১৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রথম সম্মেলনে আই পি টি এ-র সর্বভারতীয় কমিটিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছিল — বাংলা ও বোম্বাই ছাড়াও পাঞ্জাব, দিল্লি, তৎকালীন যুক্ত প্রদেশ (বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ), মালাবার (বর্তমানে কেরালা), অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ (নিজাম শাসিত) এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্স ইত্যাদি।[১৯] আই পি টি এ-র প্রথম সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী অনিল ডিসিলভা প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে মূল প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন আর এই প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছিলেন স্নেহাংশু আচার্য। এই প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি ছিল –

> "This conference held under the auspices of the Indian People's Theater Association recognizes the urgency of organizing a people's theater movement throughout the whole of India as the means of revitalizing the stage and traditional arts and making them at once the expression and organizer of our people's struggle for freedom, cultural progress and economic justice."[২০]

প্রস্তাবিত এই বয়ান থেকে স্পষ্ট যে, আই পি টি এ সেদিন গণনাট্য আন্দোলনকে গুরুত্বসহকারে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির আন্দোলন, তাদের সাংস্কৃতিক প্রগতি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যলালিত লোককলার আঙ্গিকে মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়ে। আর তার সূচনা হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ২৫ মে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে, তাই সেদিন দামোদর থ্যাকারসে হলে আই পি টি এ-র পক্ষ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাটকের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন অভিনীত

হয়েছিল বেশ কয়েকটি নাটক — বোম্বাই-এর সর্দার জাফরির *ইয়ে কিসকা খুন হ্যায়*, মারাঠি নাট্যকার অনন্ত কানেকারের ইংরেজি নাটিকা *ব্লাড অ্যান্ড টিয়ার* (*রক্ত ও অশ্রু*), চীনের পিপলস থিয়েটারের সংগঠক ও নাট্যকার টিং লিং-এর *আশ্চর্য সংগীত*-এর ইংরেজি অনুবাদ *স্ট্রেঞ্জ মিটিং*, খাজা আহমদ আব্বাসের *ইয়ে অমৃত হ্যায়* এবং বাংলা থেকে বিনয় ঘোষের *ল্যাবরেটরি* নাটক।[২১] প্রসঙ্গত বলা দরকার *ইয়ে অমৃত হ্যায়* একাঙ্কটি ছিল আই পি টি এ-র জন্য কে এ আব্বাসের লেখা প্রথম একাঙ্ক নাটক। পরে তিনি আই পি টি এ-র জন্য *জুবেইদা* নামক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন, যেটা বলরাজ সাহানি পরিচালনা করেছিলেন।[২২] সেদিনের সম্মেলনে সব থেকে নজর কেড়েছিল পাঞ্জাবের নাটক পরিবেশন — সে সম্পর্কে একটা আভাস মেলে চিন্মোহন সেহানবীশের লেখায় –

> "সব থেকে আমাদের ভালো লাগল পাঞ্জাবের বিবরণীটি। এটি পেশ করলেন শ্রীএরিক সিপ্রিয়ান।... এঁদের গণনাট্য কোন একজন নাট্যকারের লেখা নয়। সকলে মিলে নাটকের বিষয়বস্তু ঠিক করেন। তারপর একজন নাটকটি লিখে ফেলেন। এরপরেও প্রতিবারই অভিনয়ের পর সমস্ত কিষাণ দর্শকদের মতামত নিয়ে আবার বদলান হয় নাটকটিকে। এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে নাটকের রূপ। শ্রীযুক্ত সিপ্রিয়ানের বিবরণ থেকে বোঝা গেল যে পাঞ্জাবের কর্মীরা প্রথম থেকেই বিখ্যাত লেখক বা নাট্যকারের মুখাপেক্ষী হননি — একেবারে সোজাসুজি কিষাণের মধ্যে শুরু করেছেন কাজ।"[২৩]

এই বয়ান থেকে স্পষ্ট যে, পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা 'প্রথম থেকেই বিখ্যাত লেখক বা নাট্যকারের মুখাপেক্ষী' ছিলেন না। কেননা তাঁরা প্রথাগত নাটকের বাইরে বেরিয়ে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গণনাট্য লেখার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন এবং সেখানে সকলে মিলে নাটকটি গড়ে তোলেন ও 'সমস্ত কিষাণ দর্শকদের মতামত নিয়ে' নাটকের রূপটাকে বারংবার বদলাতে থাকেন —যা গণনাট্য আন্দোলনের একটা স্বতন্ত্র পথ নির্দেশ করেছিল। এই ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সাক্ষী স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্যও ছিলেন এবং পাঞ্জাবের এই নাট্যভাবনা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল পরোক্ষভাবে। তাই কি তিনি মৃত্যুর বছর দুই তিনেক আগে *অপারেশন বোড়াল* নামক একটি নাটক ঠিক একই পদ্ধতিতে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার নাটকটি যে অভিনব পদ্ধতিতে লেখা শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে অশোককুমার চক্রবর্তীর লেখাতে –

> "ঠিক হল নতুন একটা নাটক লেখা হবে। 'অপারেশান বোড়াল'। এক অভিনব পদ্ধতিতে এ নাটক লেখা হবে। বিজনদা নাটকের মূল থীম এবং মোটামুটি পাত্রপাত্রীদের এক ছক করলেন। বললেন, সব ছেলেমেয়েদের ডাকো। সকলে মিলে রোজ একটু একটু করে রিহার্সালে নাটকটা লিখবে। আমি শুধু তোমাদের গাইড্ করবো। বোড়াল থেকে উৎখাত হয়ে আসা কিছু চাষী পরিবারের জীবন সংগ্রামকে ভিত্তি করে লেখা হবে এই নাটক। সপ্তাহে একদিন করে তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমি বোড়ালে যাবো। ওখানকার লোকেদের সাথে তোমরা কথা বলবে। হিস্ট্রি-অনিকস্ তোমরা লক্ষ্য করবে, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখবে এবং স্পট থেকে খাতায় নোট নেবে। মাঝে মাঝে কলকাতার ফুটপাথে বসবাসকারী চাষী পরিবারের সাথে কথা বলবে। শুরু হল কাজ। প্রায় ৪০ জনের মত নানান বয়সের ছেলেমেয়ে জড়ো করলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রিহার্সাল রুম হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় কাজে বাধা পড়লো। ছেলেমেয়েরা নানাদিকে ছিটকে গেলো আর নতুন স্কিমে এ নাটক লেখার পরিকল্পনা গেল ভেস্তে।"[২৪]

এই *অপারেশন বোড়াল* নাটকটি যদি সম্পূর্ণ হত তাহলে এরকম অভিনব পদ্ধতি ও ভাবনা বাংলা নাটকের ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে পারতো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে শুধুমাত্র অর্থের অভাবে বিজন ভট্টাচার্যের এরকম নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমৃদ্ধ নাটকের পরিকল্পনাগুলি মাঝপথে থেমে গিয়েছিল!

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে বোম্বাইতে ২৮ মে ১৯৪৩ সালে বিভিন্ন প্রাদেশিক দলের নাচ গান ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলা থেকে দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। পাঞ্জাবের দল সেদিন খাদ্য সমস্যাকে ঘিরে একটি নাটিকা অভিনয় করেছিল। এই নাটিকাটি প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছিলেন –

> "তার ঘটনার মধ্যে কোন জটিলতা ছিল না — পাঞ্জাবের কিষাণের দুর্গতি ও কিষাণ সম্মেলনের প্রতি আস্থা নিয়েই নাটিকার আখ্যানভাগ রচিত। অভিনয় কিন্তু খুবই চমৎকার হয়েছিল, বিশেষ করে দজ্জাল গৃহিনীর ভূমিকায় বিমলা বাকায়ার অভিনয়।"[২৫]

অন্যদিকে সেদিন বাংলা থেকে বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* নাটিকার অভিনয় প্রদর্শিত হয়েছিল। ভাবতে অদ্ভুত লাগে দুটি ভিন্ন প্রদেশের দুটি আলাদা নাটক অভিনীত হয়েছিল, অথচ তাদের বিষয়ভাবনার মধ্যে কি কাকতালীয় সাদৃশ্য — দুটি নাটকই খাদ্য সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত এবং নাটক দুটি 'দজ্জাল গৃহিনী' (বিমলা বাকায়ার) ও 'ঝগড়াটে বৌ' (মণিকুন্তলা সেন) চরিত্রে দুজনের অভিনয় সকলের নজর কেড়েছিল। পরের দিন অর্থাৎ ২৯ মে ১৯৪৩ সালে কামগর ময়দানে রাতে আয়োজিত প্রায় দশ হাজার মজুরের সামনে বিভিন্ন প্রাদেশিক দল নিজেদের সংস্কৃতির নাচ গান পরিবেশন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন চিন্মোহন সেহানবীশ তাঁর এক লেখায় –

> "সর্দার জাফরি ও শ্রীজাম্বেকার মাইক্রোফোনের সাহায্যে যথাক্রমে হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় গান ও নাচের মর্ম আগেই মজুরদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, বাঙলার দল তাদের বিচিত্র নৃত্যগীত উপস্থিত করলেন তাদেরই সামনে যারা এতদিন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। আশ্চর্য্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান শেষ হয়, ততক্ষণ সেই 'অসংস্কৃত' 'Lower depths'-এর বাসিন্দারা মুষলধারে বর্ষণ সত্ত্বেও নিজ নিজ আসনে অচঞ্চল ছিল — শিক্ষিত মধ্যবিত্তসুলভ অশোভন হুড়োহুড়ি করার মত 'মার্জিত রুচি' তখনও তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেনি।"[২৬]

এই বয়ান থেকে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এতদিন ধরে 'শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে' যে সকল কৃষক মজুর এবার সময় এসেছে তাদেরকে নিয়ে তাদের সামনে শিল্পকলাকে হাজির করতে হবে। সেদিনের এই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বিজন ভট্টাচার্যকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল? তাই তিনি মৃত্যুর বছর খানেক আগে *গন্ধর্ব* পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন –

> "আমার সমস্ত নাটক, *নবান্ন* থেকে আজ পর্যন্ত যত নাটক — মধ্যবিত্ত সমাজে কিন্তু সমাদৃত হয়েছে। মধ্যবিত্ত সমাজ খুবই generous, তারা প্রগতিশীল। কিন্তু যাকে নিয়ে bid, সে maas তো আর আমার নাটক দেখেনি। কিছু কিছু হয়তো আংশিকভাবে দেখেছে, অন্য নাটক যা দেখেছে, তার চেয়ে হয়তো আমার নাটক বেশি দেখেছে। ... Naturally আমি যা মালা পেয়েছি — মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই। ... কিন্তু এটা কী? এটা তো — যারা অপসংস্কৃতির পরিপোষক তারাই আবার সংস্কৃতির পোষক — এটা কী করে হয়? মধ্যবিত্ত সমাজের সেই revolution-এর zeal তো নেই। থাকলে দেশের ভাগ্য এবং তার চেহারা অন্যরকম হত। তা কোনো কালে ছিল না, আজও নেই।"[২৭]

গণের এই অংশগ্রহণটাই বিজন ভট্টাচার্য আ-মৃত্যু চেয়েছিলেন। তিনি আ-প্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু অংশগ্রহণ সেভাবে পাননি, যতটুকু যা পেয়েছেন তা অধিকাংশ শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। তিনি তাঁর নাট্যে গণেদের সম্পূর্ণ ও সক্রিয়ভাবে অংশীভূত করতে পারেননি, কিন্তু সে চেষ্টায় অবিচল ছিলেন।

১৯৪৩ সালের ২৫ মে মাসের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন থেকেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ-র সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। যদিও এর বছর দুয়েক আগেই ব্যাঙ্গালোর (মহীশূর রাজ্যের রাজধানী শহর তখন ব্যাঙ্গালোর, স্বাধীনতার পর কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় মহীশূর) শহরেই সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) থেকে আসা এক তরুণী শ্রীমতী অনিল (মার্সিয়া) ডিসিলভা'র উদ্যোগে 'পিপলস থিয়েটার' নামক একটি গণসাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তরুণ বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার সহযোগিতায় শ্রীমতী অনিল ডিসিলভাকে সম্পাদক করে ব্যাঙ্গালোর শহরেই ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে 'পিপলস থিয়েটার' নামক সংগঠনটি গঠিত হয়েছিল।[২৮] কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই ১৯৪১ সালের আগস্ট মাস থেকে ব্যাঙ্গালোর পুলিশের বাড়াবাড়িতে 'পিপলস থিয়েটার'-র আর কোনো সাংগঠনিক কাজকর্ম করা যাচ্ছিল না বলে বাধ্য হয়ে অনিল ডিসিলভা বোম্বাই চলে যান, তখন ব্যাঙ্গালোরের 'পিপলস থিয়েটার'-র সম্পাদক হন শ্রীমতী কেশরী কেশবন।[২৯] ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে বোম্বাইয়ে এসেও অনিল ডিসিলভা পিপলস থিয়েটারের কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। বোম্বাইয়ে 'পিপলস থিয়েটার' ১৯৪২ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয়েছিল। মনে রাখা জরুরী এর ঠিক এক বছর পর আই পি টি এ-র সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বোম্বাইয়ের 'পিপলস থিয়েটার' যে ১৯৪২ সালের মে মাসে গঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জন সেনের একটি লেখা থেকে –

> "১৯৪২ সালের ১ মে আলি সর্দার জাফর রচিত এবং অনিল ডিসিলভা পরিচালিত *ইয়ে কিসকা খুন হ্যায়* নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে বোম্বাইয়ে 'পিপলস থিয়েটার' নামে সাংস্কৃতিক সংগঠনটির যাত্রা শুরু।"[৩০]

চট্টগ্রামে ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে জাপানীদের বোমা ফেলার ঘটনার প্রেক্ষাপটে *ইয়ে কিসকা খুন হ্যায়* নাটকটি লেখা হয়েছিল। এছাড়া মিল শ্রমিক টি কে সারমালকারের লেখা *দাদা* নাটকটিও পয়লা মে ১৯৪২ সালে বোম্বাইয়ের 'পিপলস থিয়েটার'-র প্রযোজনায় এবং প্রভাকর গুপ্তের পরিচালনায় বোম্বাই শহরের মিল এলাকায় অভিনীত হয়েছিল। তাছাড়াও বোম্বাইয়ের 'পিপলস থিয়েটার'-র আর একটি প্রযোজনা ছিল টি কে সারমালকারেরই লেখা *ধানি* নামক আর একটি নাটক। এছাড়াও ছিল দুটি ইংরেজি নাটক — ফোর কমরেডস এবং রোর চায়না।[৩১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বোম্বাইয়ে ১৯৪৩ সালের ২৫ মে আই পি টি এ-র প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনের আগে ব্যাঙ্গালোর ও বোম্বাই ছাড়াও মালাবার, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো জায়গাতেও পিপলস থিয়েটারের আদর্শে ছোট আকারে হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে একদিনেই যে গঠে ওঠেনি তা উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে সহজে অনুমান করা যায়। কেননা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কালে প্রগতি লেখক সংঘের হাত ধরেই সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি নাচগানসহ নাটক উপস্থাপনা শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা বিকল্পচর্চা দেশের নানা প্রান্তে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল। আর তার পরিণত মাধ্যম হিসেবে 'পিপলস থিয়েটার' বা গণনাট্য গড়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় এই 'পিপলস থিয়েটার' গড়ে তোলার নেপথ্যে রমাঁ রঁলার *দ্য পিপলস থিয়েটার* নামক বিখ্যাত বইটির একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। প্রগতি আন্দোলনের সুবাদে রলাঁর *The People's Theater* গ্রন্থটি লেখক সাহিত্যিক শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। তাই গণনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বইটির একটা গুরুত্ব যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। রঁলা তাঁর *দ্য পিপলস থিয়েটার* গ্রন্থের 'The people and the Theater' নামক 'Author's Introduction' অংশে গোড়াতেই দুটি বিষয়ের দিকে নজর দিতে অনুরোধ করেছিলেন — প্রথম বিষয়টি হল হঠাৎ করে জনগণই কেন শিল্পে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছিল, তাই তিনি লিখেছিলেন –

> "... first, the sudden importance assumed by the people in art or rather, the importance ascribed to the people, for they never speak for themselves; everyone assumes the role of spokesman for them."[৩২]

অর্থাৎ তিনি এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে জনগণের ওপরেই বেশিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, যদিও এই জনগণ নিজেরা কখনও নিজেদের কথা বলে উঠতে পারেনি। কেননা, লেখক থেকে শিল্পী সকলেই মনে করেছেন যে তারাই হলেন জনগণের একমাত্র মুখপাত্র। আর এই চিন্তার সঙ্গেই দ্বিতীয় বিষয়টি জড়িত, তা হল গণতান্ত্রিক শিল্প সম্পর্কে হাজারও মতামত –

> "and second, the extraordinary diversity of opinion as to the nature of democratic art itself."[৩৩]

তারপর তিনি দেখিয়েছেন জনগণের থিয়েটারের লক্ষ্যে যারা কাজ করছেন বলে দাবি করেন তারা দুটি পৃথক বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে যান— প্রথমদল, বর্তমানে যে থিয়েটার চলছে তাই-ই জনগণকে দিতে চান আর দ্বিতীয়দল চান জনগণের যে ব্যাপক ক্ষমতা আছে তাকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে নিয়ে একটা নতুন থিয়েটার গড়ে তুলতে। তিনি অবশ্যই দ্বিতীয়দলের পক্ষে সহমত পোষণ করেন।[৩৪] আলোচনার শেষে তিনি একটি জরুরী কথা উল্লেখ করেছেন— হাতে গোনা কতিপয় সংস্কৃতিমনস্ক লোকের চোখ দিয়ে শিল্প সাহিত্যকে না দেখে বরং জনগণের ভালোলাগা ও মন্দলাগার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। তাই তিনি বিংশশতাব্দীর শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অতীতের অভিজাত শ্রেণির শিল্প সংস্কৃতিকে আমাদের চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় বলে তিনি জানিয়েছেন। সেই সাথে বুর্জোয়া থিয়েটারের চুঁইয়ে পড়া সংস্কৃতিকে আঁকড়ে না ধরে বরং গণনাট্যের অন্য অনেক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অর্থাৎ বুর্জোয়া থিয়েটারের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে তিনি জোর দিতে চেয়েছিলেন 'পিপলস থিয়েটার'-এর নিজস্বতায়। তাই কিছু দ্বিমত

সত্ত্বেও একথা বলতেই হয় যে, ভারতীয় গণনাট্য আন্দোলনে রমাঁ রঁলার *The People's Theater* বইটির একটা জরুরী ভূমিকা ছিল।

রলাঁর পিপলস থিয়েটার বিষয়ক ভাবনা চিন্তার পাশে যদি আমরা 'গণনাট্য সংঘের ঘোষণাপত্র' দেখি তাহলে গণনাট্য সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য এবং ভূমিকা কি ছিল তার একটি হদিশ পেতে পারি –

> "সার্থক শিল্পসৃষ্টির জন্য আমাদের শিল্পকর্ম তাই জনগণের জীবন ও সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামকেই উপস্থিত করবে এবং শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য সকল স্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামী মোর্চার সাংস্কৃতিক কাহিনিরূপে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।"[৩৫]

ঘোষণাপত্রের এই বয়ান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, শিল্পকর্ম যেমন জনগণের জীবন ও সংগ্রামকে প্রকাশ করবে, তেমনই সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মেহনতী জনসাধারণের 'সংগ্রামী মোর্চার সাংস্কৃতিক কাহিনিরূপে' একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করবে। অন্যদিকে গণনাট্যের আর্দশ হিসেবে লেখা হত— 'পিপলস থিয়েটার স্টারস্ দ্য পিপল' অর্থাৎ জনগণই গণনাট্যের নায়ক।[৩৬] গণনাট্যের এই সারকথাটিকেই বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নাটকের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলতে পেরেছিলেন নিজের ছেলেবেলার বৃহত্তর গ্রামীণ লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং বামপন্থী রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক বামপন্থার যথাযথ সমন্বয়ে। জনগণই যে গণনাট্যের নায়ক, এই মূল আদর্শটি গণনাট্যের আরও দুটি বিষয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল — **প্রথমটি** হল গণনাট্যের সংঘ সংগীত এবং **দ্বিতীয়টি** গণনাট্য সংঘের প্রতীক। গণনাট্যের সংঘ সংগীত প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'এসো মুক্ত করো' গানটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি –

> "গণনাট্য আন্দোলনের মূলভাবটা যাতে জনমনে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারে তার জন্য অনুষ্ঠানের মুখবন্ধে গাইবার জন্য একটি গান রচনা করার তাগিদ উদ্যোক্তারা অনুভব করলেন। সেই অনুযায়ী আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'এসো মুক্ত করো' গানটি রচনা করেন অনুষ্ঠানের সূচনা-সংগীত হিসেবে গাওয়ার জন্য।"[৩৭]

অন্যদিকে গণনাট্যের সংঘ সংগীতের পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের প্রতীক বা লোগো কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে বোম্বাইয়ের শহরতলী আন্ধেরীতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় ব্যালে ট্রুপের মহড়া কক্ষের একদিনের একটি ঘটনার থেকে গণনাট্য সংঘের প্রতীক তৈরি হয়েছিল। সেই ঘটনার কথা বিশদে রেবা রায়চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছিলেন –

> "একদিন সন্ধেবেলায় হলঘরে বসে সেলাই করছিলাম। একপাশে রাখা ছিল বিরাট নাকাড়াটা। হঠাৎ চিত্তপ্রসাদ বললেন, শান্তিদা, আপনি ওই ড্রামটার পিছন থেকে আস্তে আস্তে নাচের ভঙ্গিতে উঠে পোজ দিয়ে দাঁড়ান তো! শান্তিদা মহান শিল্পী। ড্রাম বাজাবার দুটো কাঠি নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে ড্রামের পিছন থেকে উঠে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ড্রাম বাজাবার মুভমেন্ট করতেই চিত্তদা হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, শান্তিদা, দুমিনিট এই ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকুন, একদম নড়বেন না! চিত্তদার তুলি বিদ্যুৎগতিতে এঁকে চলল, বিশাল ড্রাম বাজাচ্ছেন এক শিল্পী। বলে উঠলেন, এটা হল 'কল অব দ্য ড্রাম'। ছোড়দা (বিনয়) বলল, 'চমৎকার! শান্তিদা! চিত্তদা! এটাই হোক আই পি টি এ-র প্রতীক।' পার্টি মেনে নিল। গণনাট্য সংঘের প্রতীকের জন্ম এইভাবেই হয়েছিল।"[৩৮]

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ১৯৪৩ সাল থেকে ভারত তথা বাংলায় যে গণ-সংস্কৃতির চর্চায় লেখক শিল্পী সাহিত্যিকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য প্রথমসারির অন্যতম নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন –

> "কমিউনিস্ট পার্টি আমার বাহ্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পিছনে মানসিকতার দিক দিয়ে সেই দিব্য শক্তির কাজ করেছে।"[৩৯]

এই সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র চাকরি ছেড়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীও হয়ে ওঠেন। আর এই তেতাল্লিশেই বাংলার বুকে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ নেমে আসে —যা সেই সময়ের শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। গণনাট্য সংঘের নাটক (বিশেষ করে বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন, জবানবন্দী* ও *নবান্ন* নাটক) ছাড়াও নাচে ও গানে, এমনকি চিত্রকলাতেও পঞ্চাশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের নানা বিষয় উঠে আসতে থাকে। পঞ্চাশের মন্বন্তর শুরুর পূর্বেই ১৯৪২ সালে ১৬ অক্টোবর মেদিনীপুর তছনছ করে দিয়েছিল সর্বনাশা সাইক্লোন, যার ফলে মেদিনীপুর সহ বাংলা চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল।[৪০] এই সাইক্লোনের কয়েকমাসের মধ্যেই শুরু হয় মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ,

কয়েক লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়, দু-মুঠো ভাতের জন্য গ্রাম থেকে শহরে এসে ভিড় করে এবং মারাও যাও লক্ষ লক্ষ মানুষ। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতিকে' চিহ্নিত করেছিলেন।[৪১] কেননা, খাদ্যশস্য থাকলেও মানুষের উপায় ছিল না তা সংগ্রহ করবার। অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেন তাঁর *Poverty and Famines* গ্রন্থে বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছিলেন –

> "In the Bengal Famine of 1943 the people who died in front of well-stocked food shops protected by the state were denied food because of lack of legal entitlement."[৪২]

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের মূল কারণ অজন্মা নয়, বরং দেশে অন্ন থাকলেও দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষ সেই অন্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই বিজন ভট্টাচার্যও এই দুর্ভিক্ষকে 'man-made' বলে চিহ্নিত করেছিলেন –

> "খাবার রয়েছে কিন্তু লোক মরে যাচ্ছে … It was madness. Everything was manipulated through the connivance of the Imperialist and our merchants and industrialists. It was a land of black marketeers. One could hear a chorus of wailing in every street, in every corner of the city — ভাত দাও, রুটি দাও, খেতে দাও।"[৪৩]

শহরের অলিতে গলিতে ক্ষুধার্ত মানুষের 'ভাত দাও, রুটি দাও, খেতে দাও'-এর মর্মান্তিক হাহাকার বা কান্নার সুর ('chorus of wailing') বিজন ভট্টাচার্যের মনে এমনভাবে গেঁথে ছিল যার ফলস্বরূপ তাঁর মননে এবং চিন্তনে 'জীবনকে আস্ত আঁকাড়া জানবার ও দেখবার উদগ্র আগ্রহ'[৪৪] প্রবল ভাবে কাজ করেছিল। আর তার প্রতিফলন ১৯৪৩ থেকে '৪৪ সালের মধ্যেই (প্রায় এক বছরের মধ্যেই) তাঁর হাতে জন্মনিয়েছিল *আগুন* (বর্ষ ২/সংখ্যা ৩৩, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩), *জবানবন্দী* (বর্ষ ৩/সংখ্যা ৮, ২৯ অক্টোবর ১৯৪৩) এবং *নবান্ন*-র (বর্ষ ৩/সংখ্যা ৩৬, ১২ মে ১৯৪৪ থেকে বর্ষ ৩/সংখ্যা ৪৩, ৩০ জুন ১৯৪৪ পর্যন্ত মোট আটটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়) মতো তিনটি কালজয়ী নাটক, যেগুলো *অরণি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজন ভট্টাচার্যের এই তিনটি নাটকের পাশাপাশি ওই সময়পর্বে রচিত হয়েছিল— বিনয় ঘোষের *ল্যাবরেটরী*, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের *হোমিওপ্যাথি*, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের *কেরানী* ও *অঞ্জনগড়*, এছাড়া তুলসী লাহিড়ীর *ছেঁড়াতার* এবং দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাস্তুভিটা* ইত্যাদি। আমরা এখানে বিজন ভট্টাচার্যের তিনটি নাটকের পাশাপাশি অন্যান্য নাটকগুলিরও একটা সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখার চেষ্টা করবো গণনাট্যের নাট্যভাষার স্বরূপটা কেমন ছিল? গণনাট্যের শুরুর পর্বে বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যচর্চায় একটি ঐতিহাসিক এবং মানবিক সংকট ও সেই সংকট থেকে উত্তরণই প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টিতে তাঁর শিল্পীসত্তা সাড়া দেয়নি, বরং তিনি জীবনমুখী শিল্পচর্চায় উন্মুখ ছিলেন। তিনি তাঁর *আগুন* নাটকটি রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন –

> "এই শহরের উপর যুদ্ধের ভয়ংকর ছায়াপাতের একটা লক্ষণ দেখেছিলাম কিউইং-এর মধ্যে — জলের কিউ, চালের কিউ। রেশন বয়-দের যেন একটা শ্রেণিই গড়ে উঠেছিল। এই ব্যাপারটা নিয়েই খণ্ড খণ্ড কয়েকটি চিত্র রচনা করেছিলাম।"[৪৫]

ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর অভিঘাত কীভাবে জনসাধারণের ওপর আছড়ে পড়েছে এবং তার একটি খণ্ড চিত্র রেশন দোকানে চালের কিউ-এ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভিড়। নাটকের একেবারে শেষ দৃশ্যটায় বিজন ভট্টাচার্য মানুষের বেঁচে থাকার ঐকান্তিক চেষ্টাকে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরলেন তাদের স্বাভাবিক কথোপকথনে –

> "৩য় পুরুষ।। এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে ব্যাস্।
> হরেকৃষ্ণ।। (বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে) এই বুঝটাই এখন দরকার।
> ৩য় পুরুষ।। তাছাড়া উপায় নেই, কোনো উপায় নেই।"[৪৬]

বিপদের দিনে একে অপরের সাথে মিলেমিশে না থাকলে বাঁচাটাই যে মুশকিল হয়ে যাবে সেই 'বুঝটাই' বিজন ভট্টাচার্য এখানে দেখাতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে বিনয় ঘোষের *ল্যাবরেটরী* নাটকেও দেখি বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদান চাল বা ভাত কিভাবে রতন অস্তিত্ব রক্ষার লড়ায়ে সকলের জন্য চাল আদায় করেছিল –

"দিইছি শায়েস্তা করে! পারেনি গুণ্ডামি করতে। শুধু তাই নয়, সকলে দু-সের করে চাল আদায় করেছে — আসছে সব এই দিকে — ঐ — [মিছিলের ধ্বনি স্পষ্টতর হয়ে উঠলো]"[৪৭]

*আগুন* নাটকটি লেখার ছ'মাস পর বিজন ভট্টাচার্য পরাণ মণ্ডলের জবানীতে *জবানবন্দী* নাটকটি লেখেন। তিনি এই নাটকটি লেখার পেছনে তাঁর প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার কথা এক সাক্ষাৎকারে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনিয়েছিলেন –

"ডি এন মিত্র স্কোয়েরের পাশ দিয়ে রোজ আপিস যাই। রোজই দেখি, গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের সংসারযাত্রা। নারী পুরুষ শিশুর সংসার। দেখি বললে ঠিক বলা হবে না। আমি লজ্জায় চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাতে পারতাম না। চোখ না তুলেও যেতে যেতে ওদের উপস্থিতি টের পেতাম। এক একদিন রাস্তার ওপরেই শায়িত মৃতদেহ, নোংরা কাপড়ে ঢাকা। মৃতদেহগুলো যেন জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোটো দেখায়। বয়স্ক কি শিশু আলাদা করা যায় না। আপিস যাওয়ার পথে অন্য দৃশ্য দেখি। টেলিগ্রাফের তার কাটতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে পাকা ফলের মতো টুপ করে রাস্তায় পড়ে অল্পবয়সি ছেলে। আমি নিজেও একদিন কলেজ স্ট্রিটে পুলিশের প্রচণ্ড মার খেলাম। আপিস থেকে ফিরবার পথে রোজই ভাবি, এই সবকিছু নিয়ে লিখতে হবে। কিন্তু কীভাবে লিখব ? ভয় করে, গল্প লিখতে গেলে সে বড়ো সেনটিমেন্টাল প্যানপেনে হয়ে যাবে। একদিন ফেরবার পথে কানে এল, পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পুজোপার্বণের গল্প, ভাববার চেষ্টা করছে, তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম। নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।"[৪৮]

বিজন ভট্টাচার্যের এই কথোপকথন বেশ কতগুলি দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই বয়ান থেকে বোঝা যায় যে কোন্ প্রেক্ষিত ও কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং কিভাবে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। **প্রথমত**, আন্তর্জাতিক (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান) ও জাতীয় ক্ষেত্রে (ভারতছাড়ো আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ) অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ও তার অমানবিক পরিণতি, যে-কারণে কলকাতার ফুটপাতে পড়ে থাকা মৃত মানুষের দেহগুলোকে তাঁর 'জীবিত মানুষের চেয়ে অনেক ছোটো' বলে মনে হওয়ার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। **দ্বিতীয়ত**, ঔপনিবেশিক শাসকের শক্তি প্রদর্শনের নমুনা হিসেবে স্বচক্ষে অল্পবয়সি ছেলেদের গোরা পুলিশের হাতে নির্মমভাবে গুলি খেয়ে মরতে দেখা এবং সেই সাথে নিজেও বেধড়ক মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে একটা উপনিবেশ বিরোধী চিন্তার বিকাশ হয়েছিল। **তৃতীয়ত**, বাস্তবের এই অমানবিক ঘটনা, যা তিনি প্রতিদিনের চলার পথে চোখ খোলা বা বন্ধ রেখে দেখেন, শোনেন তাদের নিয়ে লেখার তাগিদ অনুভব করেন ভেতর থেকে। যদিও তার আগে তিনি বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন[৪৯] তবুও এই অভিজ্ঞতাকে গল্পে প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন তা যদি 'সেনটিমেন্টাল প্যানপেনে' হয়ে যায় এই ভেবে। **চতুর্থত**, শেষ পর্যন্ত তিনি নাটক লেখার জোর পাচ্ছেন, প্রেরণা পাচ্ছেন রেলিঙের ধারে বসে নর-নারীর ফেলা আসা গ্রামজীবনের গল্প, তাদের নবান্ন ও পুজোপার্বণের গল্প শুনে। তিনি বাইরে থেকে নিজের মতো করে কিছু চাপিয়ে দিতে চাইচ্ছেন না, বরং গ্রামের চাষাভুষো মানুষ ওরা নিজেরাই যেন 'নিজেদের কথা' বলছে এই প্রকরণেই বা টেকনিকে নাটক লিখছেন। যেখান থেকে তাঁর একটা নিজস্ব নাট্যভাষা গড়ে উঠছে — যা কোনো পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অনুসারী নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে এদেশীয় এবং লোকায়ত প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা।

বিজন ভট্টাচার্যের *জবানবন্দী* নাটকে গ্রামের চাষিদের করুণ পরিণতি এবং গ্রাম ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় ভাতের অভাবে মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর আগে বৃদ্ধ পরাণ মণ্ডল স্বপ্ন দেখে সোনা ধানের, স্বপ্ন দেখে নতুন করে ধান ফলানোর। তাই সে রমজান ও বেন্দাদের গ্রামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কলকাতার ফুটপাতেই মারা যায় –

"ঘরে ফিরে যা রমজান — তোরা সব ঘরে ফিরে যা। আমার — সেই মরচে পড়া নাঙ্গল ক'খান আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা।"[৫০]

'মাঠের সম্রাট' পরাণ মণ্ডলও সোনা ধানের স্বপ্ন দেখেছিল। এরই পাশাপাশি যদি আমরা *অঞ্জনগড়* নাটকটি রাখি তাহলে দেখবো নাটকের যবনিকায় সুনীল চট্টোপাধ্যায় মিস্টার মুখার্জির মুখে সাব-হিউমান ক্লাসের মানুষদের জন্য প্রশ্ন রেখেছেন –

> "(ধীরে দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া) কিন্তু আজকের এই ইল-ফেড্, ইল-ডেভেলপড্, সাব-হিউমান ক্লাসের মানুষরা — হাজার হাজার বছর পরে যখন আর্কেয়া-লজিস্টদের কৌতূহল মেটাবে, তখন তারা কি দেখবে? ... দেখবে শুধু কতগুলো ফসিল — ভাববে, সাডেন কোনো ডিসাস্টার-এ এরা মাটির তলায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। (সম্মুখপানে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে) তারা দেখছে শুধু কতকগুলো সাদা সাদা ফসিল — কিন্তু কই? আজকের এত লাল রক্ত কোথা?"[৫১]

যুদ্ধের ছায়ায় জনতার কিউ-এ যে *আগুন*-এর জন্ম হয়েছিল তার ভেতর দিয়েই গ্রাম থেকে আসা খেতে না পাওয়া পরাণ মণ্ডলেরা 'সোনাধানের নান্দীপাঠ'[৫২] করতে করতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কলকাতার ফুটপাতে মারা যাবে, আর প্রধান সমাদ্দারেরা 'ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা'[৫৩] বলতে বলতে 'গাঁতায় খাটা' চাষিদের নবান্ন উৎসবে গ্রামে ফিরে যাওয়ার একটা বৃহত্তর পটভূমিতে বিজন ভট্টাচার্যের হাতে *নবান্ন* নাটক গড়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, আধিদৈবিক দুর্ঘটনা এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেকটি সমস্যা এমন বিরাট আর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে যেন মনে হচ্ছে অনর্থ যা কিছু ঘটছে তার উপর মানুষের যেন কোনো হাত নেই। সচেতন বুদ্ধিজীবী মনও সংশয়ে আর বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় ঘূর্ণায়মান। চরমতম এমনই সেই দুঃসময়ে *জবানবন্দী*-র ইঙ্গিতের সূত্রধার শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরার দেশ মেদিনীপুর জেলার পটভূমিকায় প্রধান সমাদ্দারের নতুন জবানবন্দীতে *নবান্ন* নাটক লিখতে বসলাম।"[৫৪]

বোঝাই যাচ্ছে চল্লিশের প্রথমার্ধে সময়ের অভিঘাত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিমুখ 'চূড়ান্ত একটা পরিণতির দিকে' কীভাবে বাঁক নিয়েছিল, যার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-মরণের সমস্যা 'বিরাট আর ব্যাপক' হয়ে উঠেছিল, যদিও তার পেছনে ছিল স্বার্থান্বেষী মানুষের কারসাজি। সেই সময়ের এই পরিস্থিতিতে বিজন ভট্টাচার্যের দিক নির্দেশকারী নাটক *নবান্ন* প্রচলিত থিয়েটারের বিষয় ও আঙ্গিককে রীতিমত চ্যালেঞ্জ করেছিল, আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল জনমানসে। এই নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়েই 'সমস্ত জুড়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী'[৫৫] গড়ে উঠেছিল —এমনই মতামত শ্রীরঙ্গীন হালদার সবিস্তারে জানিয়েছিলেন—

> "কি নাট্যকলায়, কি অভিনয়ে, কি মঞ্চসজ্জায় দেখলাম এক বাস্তবতা, জীবনমুখীনতা। ফলে সমস্ত অভিনয়ে একটা অদ্ভুত সরলতার সঞ্চার হয়েছে — আগেকার যুগের চমক, চটক ও রোমান্সের স্থানে এসেছে সহজ বলিষ্ঠ জীবন। তা সেই অতি-সূক্ষ্মতারই যেন একটা প্রতিবাদ বলিষ্ঠতার স্বাভাবিকতার, যেন একটা ইঙ্গিত তাদের এই সামগ্রিক ও বাস্তব অভিনয়কলার মধ্য দিয়ে দর্শককেও সচকিত ও সচেতন করে তোলে —।"[৫৬]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, নাটকটিতে একদিকে 'বাস্তবতা' ও 'জীবনমুখীনতা', অন্যদিকে প্রচলিত নাট্যরীতির প্রতিবাদে 'সহজ বলিষ্ঠ জীবন' এবং সেই সঙ্গে দর্শককেও সচেতন করে তোলার একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তাই নাটকটির শেষে দয়ালের মুখে নাট্যকার আহ্বান করেছিলেন— "জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ।"[৫৭] এইভাবে জনসাধারণের সম্মিলিতভাবে 'জোর প্রতিরোধ' শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেমন *নবান্ন* নাটকে প্রতিফলিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের *হোমিওপ্যাথি* নাটকের শেষে নিবারণের সংলাপে 'একগাট্টা' (অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে) হওয়ার সোচ্চার শোনা যায় :

> "আমরা একগাট্টা হ'লে বোমা থেকে আত্মরক্ষাও করতে পারবো, আর বোমারু যদি কোনোদিন নেমে আসে, তাদেরও জব্দ করতে পারবো।"[৫৮]

বিজন ভট্টাচার্যের তিনটি নাটকের পাশাপাশি একই সময়ে (বলা ভালো অল্প সময়ের আগে বা পরে) লেখা অন্যান্য নাটকের মূল বক্তব্য তুলে এনে লক্ষ্য করা গেল যে, এরা সকলেই জনসাধারণের মিলিত প্রতিরোধ, প্রতিবাদ এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক আলাদা মনযোগের দাবি রাখে —যেহেতু তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক আমাদের প্রথাগত নাট্যরীতিকে অনুসরণ করেনি। তিনি সচেতনভাবেই 'নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে'[৫৯] —এই টেকনিক বা কৌশলকে নাটকে ব্যবহার করে নিজস্ব নাট্যভাষা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা তিনি একদিকে যেমন বৃহত্তর জনসাধারণের লোকায়ত

সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছেলেবেলা থেকেই অর্জন করেছিলেন, তেমনই অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে এসে চারের দশকে বামপন্থী সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন - আর এই দুইয়ের যথাযথ সমন্বয়ে গণনাট্যের নাট্যভাষা বাংলা নাটক তথা থিয়েটারে এক স্বতন্ত্র পথ তৈরি করেছিল।

[**সংকেত সূচি :** সং ও বি. : সংকলন ও বিন্যাস। বি. দ্র. : বিশেষ দ্রষ্টব্য। পৃ. পৃষ্ঠা। সম্পা. : সম্পাদনা / সম্পাদিত। পু. মু. : পুনর্মুদ্রণ। এ. পৃ. স. উ. : এভাবেই পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখিত। যৌ. প্র. : যৌথ প্রয়াস। বা. অ. : বানান অপরিবর্তিত। অনু. : অনুবাদ। ব. : বঙ্গাব্দ । প. রা. ক. : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। প্রা. লি. : প্রাইভেট লিমিটেড। সং ও সম্পা. : সংকলন ও সম্পাদনা। অনু. ও সম্পা. : অনুবাদ ও সম্পাদনা। সং : সংকলন।]

**তথ্যসূত্র :**

১. সেনগুপ্ত শচীন্দ্রনাথ, 'আজকার উৎসবের দিনে', *গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর,* (সম্পা.) বাবলু দাশগুপ্ত ও শিব শর্মা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, গণনাট্য প্রকাশনী, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (প. রা. ক.), ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৭২
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর* বলে উল্লেখ করা হবে।]
২. রায়চৌধুরী সজল, '*নবান্ন*-র আগে', *গণনাট্য কথা,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ ব., পৃ. ২৩ - ২৪
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *গণনাট্য কথা* বলে উল্লেখ করা হবে।]
৩. সেহানবীশ চিন্মোহন, 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে', *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, সেরিবান, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩২
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে* বলে উল্লেখ করা হবে।]
৪. ভট্টাচার্য বিজন, 'গ্রন্থপরিচয়' (*আগুন*), *রচনাসংগ্রহ ১,* (সম্পা.) নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৪৪৭
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *রচনাসংগ্রহ ১* বলে উল্লেখ করা হবে।]
৫. মজুমদার দিলীপ ও জানা খোকনচন্দ্র (সং ও সম্পা.), *অরণি : সূচি ও সংকলন,* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দুর্বার কলম, ১ মার্চ ২০০৮, পৃ. ৩৮
৬. সেহানবীশ চিন্মোহন, 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে', *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* পৃ. ৩৩
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৯. রায়চৌধুরী সজল, '*নবান্ন*-র আগে', *গণনাট্য কথা,* পৃ. ২৪
১০. সেহানবীশ চিন্মোহন, 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে', *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* পৃ. ৩৬
১১. বেরা অঞ্জন, '১৯৪০-এর দশকে', *পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর,* প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, গণনাট্য প্রকাশনী, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (প. রা. ক.), ৮ এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৩৯
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ* বলে উল্লেখ করা হবে।]
১২. কুমার দয়াল, 'গণনাট্য আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশে হুগলী জেলা', *গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর,* পৃ. ১৫৭
১৩. সেহানবীশ চিন্মোহন, 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে', *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* পৃ. ৩৬
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫ - ৩৬
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
১৭. বেরা অঞ্জন, '১৯৪০-এর দশকে', *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ,* পৃ. ৩৮

১৮. Pradhan Sudhi (Edited), *Marxist Cultural Movement in India*, Vol. I, First Published, Kolkata, Published by Mrs. Santi Pradhan, 1985, pp. 152 - 153

১৯. Pradhan Sudhi, op cit. pp. 152 - 153

২০. Pradhan Sudhi, op cit. p. 51

২১. সেহানবীশ চিন্মোহন, 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে', *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, পৃ. ৩৬ - ৩৭

২২. Abbas K A, *I am not an Island*, First Edition, New Delhi, Vikas Publication, 1977, pp. 234 - 235

২৩. সেহানবীশ চিন্মোহন, 'প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে', *৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, পৃ. ৩৬ - ৩৭

২৪. চক্রবর্তী অশোককুমার, 'কবচ কুণ্ডল-এর বিজন ভট্টাচার্য', *গন্ধর্ব*, আশ্বিন ১৩৮৪ ব., পৃ. ৩৫

২৫. সেহানবীশ চিন্মোহন, *প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনে, ৪৬ নং একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে*, পৃ. ৩৭

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২৭. ভট্টাচার্য বিজন, 'ক্রাইসিসে এ-ই হয় এবং এ-ই হচ্ছে', *লিখন ভাষণ কথোপকথন : বিশিষ্ট বিজন*, (সং ও বি.) শিবাদিত্য দাশগুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, মনফকিরা, জুন ২০০৫, পৃ. ৮৬

[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *বিশিষ্ট বিজন* বলে উল্লেখ করা হবে।]

২৮. বেরা অঞ্জন, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : প্রেক্ষাপট ও প্রতিষ্ঠা', *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ*, পৃ. ৩৪

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

৩০. সেন নিরঞ্জন, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ইতিহাস', *এপিক থিয়েটার*, আগস্ট ১৯৭৮, পৃ. ২৪

৩১. বেরা অঞ্জন, 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : প্রেক্ষাপট ও প্রতিষ্ঠা', *ভারতীয় গণনাট্য সংঘ*, পৃ. ৩৬

৩২. Rolland Romain, 'Author's Introduction' ('The people and the Theater'), *The People's Theater*, Translated by Barrett H. Clark, First Published, New York, Henry Holt and Company, 1918, p. 4

৩৩. Rolland Romain, op cit. p. 4

৩৪. Rolland Romain, op cit. p. 4

৩৫. 'গণনাট্য সংঘের ঘোষণাপত্র', *গ্রুপ থিয়েটার*, বর্ষ ৪ সংখ্যা ১, শারদীয় ১৯৮৮, পৃ. ৮৪

৩৬. রায়চৌধুরী সজল, 'ভূমিকা', *গণনাট্য কথা*, পৃ. ৬

৩৭. মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র, 'গ্রন্থপরিচয়' ("এসো মুক্ত করো"), *নবজীবনের গান ও অন্যান্য*, (সং.) প্রসূন দাশগুপ্ত ও সুভাষ চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন, ৭ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ৯৫ - ৯৬

[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *নবজীবনের গান ও অন্যান্য* বলে উল্লেখ করা হবে।]

৩৮. রায়চৌধুরী রেবা, *জীবনের টানে শিল্পের টানে*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, থীমা, ১৯৯৯, পৃ. ১৭

[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *জীবনের টানে শিল্পের টানে* বলে উল্লেখ করা হবে।]

৩৯. ভট্টাচার্য বিজন, 'নবান্ন ও আজ', *বহুরূপী ৩৩*, অক্টোবর ১৯৬৯, পৃ. একশ একাত্তর [এ. পৃ. স. উ.]

৪০. সিংহ ডঃ দীনেশচন্দ্র, 'গ্রন্থকার ও সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ', *রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর*, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., অগ্রহায়ণ ১৪০৫ ব., পৃ. ১৩

[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে গ্রন্থটি *রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর* বলে উল্লেখ করা হবে।]

৪১. মুখোপাধ্যায় শ্যামাপ্রসাদ, 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', *রাষ্ট্র সংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর*, পৃ. ২০

৪২. Sen Amartya, 'The Great Bengal Famine', *Poverty and Famines : An Essay on Entitlement and Deprivation*, First Published, Oxford, Clarendon Press, 1981, pp. 52 - 85

৪৩. ভট্টাচার্য বিজন, 'মনে হয় একটা ক্রুসেড আরম্ভ করে দিই', *বিশিষ্ট বিজন*, পৃ. ৭৩
৪৪. মৈত্র জ্যোতিরিন্দ্র, 'আমাদের বিজন', *রচনা সংগ্রহ ১*, (সম্পা.) শিবাদিত্য দাশগুপ্ত ও (সম্পা. সহ.) সুমিতা সামন্ত, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, জুলাই ২০১২, পৃ. ১৪৭
৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায় শমীক, '*নবান্ন*-এর ধারা থেকে অন্য ধারায় : একটি অসম্পূর্ণ আলোচনা', *বহুরূপী ৩৪*, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (সম্পা.) নবান্ন স্মারক সংখ্যা (দ্বিতীয় সংকলন), জুন ১৯৭০, পৃ. নব্বই [এ. পৃ. স. উ.]
৪৬. ভট্টাচার্য বিজন, 'আগুন' (৫ ম দৃশ্য), *বহুরূপী ৩৩*, অক্টোবর ১৯৬৯, পৃ. ৪০ - ৪১
৪৭. ঘোষ বিনয়, 'ল্যাবোরেটরী' (৩য় দৃশ্য), *বহুরূপী ৩৩*, অক্টোবর ১৯৬৯, পৃ. ২৫
৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শমীক, 'ভূমিকা', *রচনাসংগ্রহ ১*, বিজন ভট্টাচার্য, পৃ. বারো - তেরো [এ. পৃ. স. উ.]
৪৯. বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয় *অরণি* পত্রিকায় ২৩ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইতিপূর্বেই এই পত্রিকায় তাঁর দুটি ছোটগল্প *সাইসমোগ্রাফ* (১/৬, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১), এবং *কার্ণিভ্যাল* (২/১২, ২০ নভেম্বর ১৯৪২) প্রকাশিত হয়েছিল। *আগুন* প্রকাশিত হওয়ার ছ'মাস পরেই ২৯ অক্টোবর ১৯৪৩ সালে *অরণি* পত্রিকায় *জবানবন্দী* বেরোয়। আর এই দুটি নাটকের মধ্যবর্তী সময়ে আরও দুটি ছোটগল্প *সন্তুর মা* (শারদীয়, ১৩৫০ ব. / ১৯৪৩) এবং *সিল্কের শাড়ি* (৩/৬, ১ অক্টোবর ১৯৪৩) প্রকাশিত হয়েছিল।
[ দ্র. : লাহিড়ি কার্তিক, 'অরণি : একটি আন্দোলন, একটি পত্রিকা', *এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৮৮ ব., পৃ. ৮২ এবং মজুমদার দিলীপ ও জানা খোকনচন্দ্র (সং ও সম্পা.), *অরণি : সূচি ও সংকলন*, পৃ. ৭৫ - ৮৩ ]
৫০. ভট্টাচার্য বিজন, 'জবানবন্দী' (৪র্থ দৃশ্য), *বহুরূপী ৩৪* (নবান্ন-স্মারক-সংখ্যা, দ্বিতীয় সংকলন), (সম্পা.) চিত্তরঞ্জন ঘোষ, জুন ১৯৭০, পৃ. ৩১
৫১. চট্টোপাধ্যায় সুনীল, 'অঞ্জনগড়', *বহুরূপী ৩৩*, অক্টোবর ১৯৬৯, পৃ. ৮৬
৫২. ভট্টাচার্য বিজন, 'ভূমিকা', "নবান্ন", *রচনাসংগ্রহ ১*, পৃ. ৩৭
৫৩. ঐ, 'নবান্ন' (৩য় অঙ্ক / ২য় দৃশ্য), *রচনাসংগ্রহ ১*, পৃ. ৯৭
৫৪. ঐ, 'ভূমিকা', *নবান্ন*, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ২৭ - ২৮
৫৫. হালদার শ্রীরঙ্গীন, 'বাংলা নাট্যকলার নূতন সূচনা', *বহুরূপী ৩৩*, অক্টোবর ১৯৬৯, পৃ. ৯৪
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪
৫৭. ভট্টাচার্য বিজন, *নবান্ন* (৪র্থ অঙ্ক / ২য় দৃশ্য), প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ, ২০০৪, পৃ. ১২০
৫৮. ভট্টাচার্য মনোরঞ্জন, 'হোমিওপ্যাথি', *বহুরূপী ৩৩*, অক্টোবর ১৯৬৯, পৃ. ৩২
৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায় শমীক, 'ভূমিকা', *রচনাসংগ্রহ ১*, বিজন ভট্টাচার্য, পৃ. বারো - তেরো [এ. পৃ. স. উ.]